ইসলামি সাহিত্যের ধারায় সৈয়দ নুরুদ্দিনের ‘রাহাতুল কুলুব’ কাব্যের অবস্থান ও ভূমিকা

আজিজুল হক

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালসীমা প্রায় আট শত বছরের। দীর্ঘ এই কালপর্বে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে হিন্দু সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় ছিল বলে একটা ধারণা বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল। সম্প্রীতি প্রচলিত এই ধারণা প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়েছে। একটু অনুসন্ধান করে আমরা দৌলত কাজি বা আলাওলের বাইরেও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসরে এমন অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যেকের দেখা পাচ্ছি যাঁদের রচনা বিষয়বৈচিত্র্যে ও গুণেমানে আক্ষরিক অর্থে অসামান্য। উদাহরণ স্বরূপ মুহম্মদ কবীর, আব্দুল হাকিম, বাহরাম খান প্রমুখ ও তাঁদের সৃষ্টি মধুমালতী, লালমোতি সয়ফুলমুলক, লায়লী মজনু প্রভৃতির নাম করা যায়। মুসলিম কবিদের রচনা যেমন গুণেমানে অসামান্য তেমনি পরিমাণের বিচারে নিতান্ত কম নয়। শতাধিক কবির সম্মিলিত প্রয়াসে রচিত হয়েছে কয়েক শত কাব্য-কবিতা। মুসলিম কবি রচিত এইসব কাব্য-কবিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি ধারা হল ইসলামি সাহিত্য। আমাদের আলোচ্য কবি সৈয়দ নুরুদ্দিনের ‘রাহাতুল কুলুব’ ইসলামি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

ইসলামি সাহিত্যের দুটি প্রধান শাখা বর্তমান—(ক) ইসলামি শরা-শরিয়ত বা ধর্মীয় তত্ত্বমূলক রচনা (খ) মুসলিম মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিজয়কাব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, ইসলামি সাহিত্য কী? এর উত্তরে বলা যায় ইসলাম ধর্ম অবলম্বিত শরা-শরিয়ত, ‘কোরান’, ‘হাদিস’ এর তত্ত্বকথা; ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি যে কাব্যের উপজীব্য তাই ইসলামি সাহিত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলিম কবিদের রচনা মাত্রকে ইসলামি সাহিত্য হিসাবে গণ্য করার একটা প্রবণতা রয়েছে। এটা ঠিক নয়। সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন ‘ইসলামি সাহিত্য’। আমরা এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করি না। মুসলিম কবিদের দ্বারা রচিত ধর্মীয় তত্ত্বকথা নিরপেক্ষ কোনো রচনাকে কিছুতেই ইসলামি সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা চলে না। যেমন– দৌলতউজির বাহরাম খানের ‘লায়লী-মজনু’ কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় নর-নারীর প্রেমকথা। এর সঙ্গে ইসলাম ধর্ম বা শরিয়তের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। এই অবস্থায় কাব্যটিকে যদি ইসলামি সাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তবে অমুসলিম কবিদের দ্বারা চরিত মধ্যযুগের বাংলা সহিত্যকেও হিন্দু সাহিত্য বলতে হয়। বলাবাহুল্য এমন সাম্প্রদায়িক বিভাজন একেবারেই কাম্য নয়।

২

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্ভার কয়েকটি ধারায় বিন্যস্ত। যেমন–বৈষ্ণব সাহিত্য (বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি) অনুবাদ সাহিত্য (কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালী', ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসুর - 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'মহাভারত' অনুবাদক কাশীরাম দাসের- 'কাশীদাসী মহাভারত), মঙ্গলকাব্য (বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ', মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' ইত্যাদি), জীবনীসাহিত্য (বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত', জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল', লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি)। ইসলামি সাহিত্যও এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। অন্য ধারাগুলির নেপথ্যে যেমন সমাজ-দেশ-কাল-পাত্র পরিপ্রেক্ষিত কাজ করেছে, ইসলামি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক নাগাদ আরব-বণিকদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করে। তারপর মুসলমান সাধক-দরবেশদের অসামান্য প্রচারণায় এখানে ইসলামের দ্রুত প্রচার-প্রসার হয়। এদিকে ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক গৌড় অধিকৃত হলে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে আসে। এতে আমাদের দেশে ইসলামের প্রচার প্রসারের আরও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রথম অবস্থায় আলেম-উলামা, সুফি-দরবেশ শ্রেণি মুখে মুখেই ইসলাম প্রচার করতেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজে সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে অবস্থার পরিবর্তন হয়। মৌখিক রূপে শরাশরিয়তের কথা সমাজের সকল সদস্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না; লিখিত পুথি পুস্তকের মাধ্যমেও ইসলামের প্রাত্যহিক নীতিমালা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়; আর তারই সূত্রে রচিত হয় ইসলামি তত্ত্বকথামূলক বিভিন্ন গ্রন্থ। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছিল এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা সর্বাত্মক রূপ পায়। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইসলামি সাহিত্য ধারার এই পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবণতাকে নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

ক) প্রথম দিকে মুসলিম সমাজ স্বল্প পরিসরে ছিল বলে বাংলায় শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। পরবর্তী কালে মুসলিম সমাজ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তখন বই পড়ে ইসলামের নীতিমালা জেনে নেওয়ার মতো যোগ্যতা গড়ে ওঠেছে অনেকের মধ্যেই। এই অবস্থায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় বিশেষ রূপে নীতিকাব্যের চর্চা হয়েছে।

খ) ইসলামি তত্ত্বকথা মূলক গ্রন্থ সমূহ আরবি-ফারসি ভাষাতে লিপিবদ্ধ ছিল। সাধারণ বাঙালি পাঠকদের পক্ষে এইসব গ্রন্থের পাঠ নেওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ফলে বাংলাভাষী মানুষদের কথা চিন্তা করে ইসলামি তত্ত্বকথা মূলক আরবি-ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করা বা এর সারমর্ম অনুসরণে নতুন গ্রন্থ রচনা করাটা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

গ) একটা সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ইসালামি শাস্ত্রকথা চর্চা করা যাবে কিনা এ নিয়ে মুসলিম সমাজ দ্বিধান্বিত ছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা যেমন বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করে রেখেছিল তেমনি গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যেও একই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা বিষয়ে কিছু মুসলিম লেখকদের বিশেষ অনুরাগ জন্মায়। তারাই দ্বিধাহীন ভাবে বাংলা ভাষায় নীতিশাস্ত্র বিষয়ক কাব্যচর্চায় অগ্রসর হন।

ঘ) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে ইসলামের যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রভাবে উৎসাহী কবি সাহিত্যিকরা দেশীয় ভাষায় জনসমক্ষে ইসলামের আদর্শ প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই জন্যেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু নীতি কাব্য রচিত হয়েছে।

ঙ) বাঙালি মুসলমান সমাজের অধিকাংশ সদস্য হলেন ধর্মান্তরিত। সেদিন বাংলাদেশে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল তারা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ হিন্দু বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্য। উচ্চসমাজ বিশেষত ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে এরা একাধারে সুফি সাধকদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও ইসলামের সাম্য নীতির প্রভাবে ধর্ম পরিবর্তন করে। ধর্মান্তরিত এই বাঙালি সমাজের পক্ষে দ্রুত আরবি- ফারসি ভাষা আয়ত্ত করে শাস্ত্র কথার পাঠ নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। এদের জন্য বাংলায় শাস্ত্রকথামূলক গ্রন্থ রচনার কোনো বিকল্প ছিল না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইখতিয়ারউদ্দীনের গৌড় বিজয়ের পর বাংলাদেশে ব্যাপক হারে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় অর্ধাংশ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই ইসলামি সাহিত্যের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজের ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে।

সেদিন বঙ্গদেশে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই প্রায় অন্ত্যজ হিন্দু বা বৌদ্ধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রামাইপণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' ও 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' শীর্ষক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রচনাটির অভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে স্পষ্ট যে এটি তুর্কি আক্রমণের পর অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের রচনা। 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'-র অংশ বিশেষ : ''জাজপুর পুরি বাদি সোল নাঅ ঘর বেদি,/বেদিলায় কন্নএ নগুন।/মালদহে লাগে কর নচিনে আপন পর/জালের নহিক দিশপাশ।/বলিষ্ট হইআ বড়, দশবিশ হৈয়্যা জড়,/সদ্ধর্মীরে করএ বিনাশ।।/বেদে করি উচ্চারণ বেয়্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন, /দেখিআ সভায় কম্পমান।'' এখানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী স্বধর্মীদের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনার সঙ্গে মুসলমানদের জাজপুরে প্রবেশ ও ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবী'-র রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণের ন্যায় একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। উপরিউক্ত কবিতাটি থেকে জানা যায়–একস্থানে যোযো শত বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস। তারা কানে পৈতা নিয়ে দক্ষিণা নিতে যায় এবং যার ঘরে দক্ষিণা পায় না তার সংসার পুড়িয়ে দেয়। মালদহে তারা আপন-পর না ভেবে কর বসিয়ে দেয়। উচ্চ ব্রাহ্মণদের মুখ দিয়ে ঘন ঘন আগুন বের হয় যা দেখে ভয়ে কম্পমান হয় সাধারণ মানুষ। এই প্রেক্ষিতে সেদিন উচ্চ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

ধর্মান্তরিত এই সম্প্রদায় ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। ফলে বাংলায় ইসলামি সাহিত্য রচনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে বলে মনে করা হয়।

শরিয়তি জ্ঞান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সেদিনের ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ নামে মাত্র ধর্মান্তরিত ছিল। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তাদের পূর্ববর্তী ধর্মবোধ অনুসারে মূর্তি পূজা, হোলি উৎসব, পিরপূজা প্রভৃতির চর্চা করত। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী এ সব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়। অর্থাৎ ধর্মান্তরিত এই মুসলমান সমাজে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুফি সাধকরা তাদের নির্দিষ্ট ধর্মাদর্শের প্রেক্ষিতে দেশীয় মুসলমানদের এই যে অবস্থান তার সমর্থন না করলেও সরাসরি বিরোধিতা করেননি। এতে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়নি।

ইসলাম চুড়ান্ত রূপে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মব্যবস্থা। ইসলাম সম্পর্কে 'কোরান'-এ বলা হয়েছে :''ইসলাম হচ্ছে আল্লার কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম'' (সুরা নং-৩, আল ইমরান, আয়াত : ১৯)—একজন ইমানদার ব্যক্তি একমাত্র ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করতে পারে অন্য কারও কাছে নয়। তাকে মান্যতা দিতে হয় 'কোরান' ও 'হাদিস' নির্দেশিত ইসলামি রীতি-নীতিকে। ইসলামি এই আদর্শের সাপেক্ষে সেদিনের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের যথাযথ মুসলিম বলে গণ্য করা যায় না; তারা নামে মাত্র মুসলমান। নামধারী এই মুসলমান সমাজকে তাদের ভ্রান্তির জাল থেকে মুক্ত করে ইসলামের সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেউ কেউ। ইসলামি সাহিত্য তাঁদের সেই উদ্যোগের ফসল।

ইসলামি সাহিত্যে তথাকথিত ধর্মকথা বা শরিয়তের নীতি নির্দেশ একমাত্র উপজীব্য বিষয় নয়। ইসলাম হল একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে মানুষের পারলৌকিক মুক্তির পাশাপাশি ইহলৌকিক জীবনের লাভালাভের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইসলামি সাহিত্য রচনা করতে বসে এই বিষয়টি বিশেষরূপে স্মরণে রেখেছিলেন সেদিনের কবি-সাহিত্যিকরা। ফলত ইসলামি সাহিত্যে ধর্মকথার পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনের কথাও সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়দায়িত্ব কী, প্রতিবেশির প্রতি একজন সামাজিকের কী কর্তব্য এ সব বিষয় ভিড় করে এসেছে ইসলামি সাহিত্যের অঙ্গনে।

৩

প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম পর্বে মুসলমান কবিরা রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান রচনা করেছিলেন বেশি করে। পরে অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা ইসলামি সাহিত্য রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং একটা সময় এই ধারার কাব্য রচনায় রীতিমতো জোয়ার আসে। বহু সংখ্যক কবির সোচ্চার পদচারণায় মুখরিত হয় বাংলার সাহিত্যের অঙ্গন। এই পর্বে যাঁরা ইসলামি সাহিত্য রচনায় উল্লেখ্যযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল :

কবির নাম	সময়কাল	কাব্য
ক) শেখ সুলায়মান	ষোড়শ শতক	অসিয়তনামা
গ) আলাওল	১৫৯৭-১৬৭৩	তোহ্‌ফা
ঘ) আব্দুল হাকিম	সপ্তদশ শতক	দুররে মুজলিশ
ঙ) শেখ চান্দ	১৬৭৫-১৭৪৫	কেয়ামতনামা
চ) মুজাম্মিল	অষ্টাদশ শতক	নীতিশাস্ত্র বার্তা
ছ) শেখ পরান	”	কায়দানি কেতাব
ঝ) সৈয়দ নুরুদ্দিন	”	রাহাতুল কুলুব

প্রাগাধুনিক পর্বে ইসলামি বাংলা সাহিত্যের এই যে পরিপ্রেক্ষিত ও প্রবণতা সেই ধারায় সৈয়দ নুরুদ্দিনের রাহাতুল কুলুব কাব্যটির বিচার আমাদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপথে পা রেখে প্রথমেই বলতে হয়, ইসলামি সাহিত্যের সাধারণ নীতি মেনে মানব সমাজকে ইসলামি নীতির আলোকে সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত করার অন্তর্গত প্রেরণা থেকেই কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন তাঁর রাহাতুল কুলুব কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যে বর্ণিত বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যাবে প্রথম চারটি পর্বে নীতিকথা প্রচারের মানসক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা আছে এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পারিবারিক ও সামাজিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতিমালা অনুসরণ করা বা না করার শুভাশুভ পরিণাম সমূহের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের মৌলিক প্রত্যয় সমূহ বর্ণনা করার পরপরই কবি মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিয়ে শুরু করেছেন নীতিকথার আলোচনা। কবি যেন বলতে চাইছেন মাতা-পিতার সেবাই হচ্ছে সকল নৈতিক কর্তব্যের মূল। ইসলামে আদব-কায়দা ও আচার-আচরণের যে ধারা রয়েছে তাতেও মাতা-পিতাকে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কবি হাদিস অনুসারে মা-বাবার প্রতি পুত্রের দশটি কর্তব্যের বিবরণ দিয়েছেন—ক। খাদ্য পাণীয় দেওয়া খ। বস্ত্রাদি দেওয়া গ। সম্মান করা ঘ। ভয় করা ঙ। ডাকলে শীঘ্র জবাব দেওয়া চ। কঠোর কথা না বলা ছ। সঙ্কটপূর্ণ কাজের হুকুম করলেও তা পালন করা জ। পিতা মাতার নাম ধরে না ডাকা ঝ। তাদের আগে আগে না চলা ঞ। পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা। এই দশটি পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতাকেও পুত্রের প্রতি কর্তব্য পালনের কথা ব্যক্ত করেছেন কবি— নাম রাখা, শিক্ষা দেওয়া ও বিয়ে দেওয়া। কবির ভাষায় :“পুত্র সবের তিন দায় মা-বাপ উপর।/একে একে কহি তাহা শুন সব নর।।/প্রথম জানিও শুদ্ধনাম রাখিবেক।/দ্বিতীয় কোরান শরিফ পড়াইবেক।/তৃতীয় বালক যদি হইল যৌবন।/ভালোমত কন্যা আনি বিবাহ করান।।”

গৃহগত সৌজন্যের প্রথম হকদার যেন মাতা-পিতা তেমনি সামাজিক সৌহার্দ্যের প্রথম দাবিদার নিকটতম প্রতিবেশী। তাই কবি নীতি প্রচারের প্রথম পর্ব রচনা করেন এই দুটো

বিষয় দিয়ে। কবি হাদিসের বরাত দিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যের বিবরণ দিয়েছেন :''রসুলে বুলিলা কহি শোন দিয়া মন।/পড়শিক হস্তপদ জান সর্বজন।।/যদি কর্জ মাগে তাকে হাসানা সে দিবা।/আমন্ত্রণ কৈলে ঘরে অবশ্য যাইবা।।/পড়শি বিমারে যদি হইল জীর্ণকায়।/নিত্যি নিত্যি গিয়া তাকে তুষিবা সদায়।।" এরপর কবি বিবিধ ব্যক্তিগত পাপের ও সামাজিক দুর্নীতি বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথমেই এসেছে সুরাপান প্রসঙ্গ : ''মাষাভার সুরা যেবা পিব পৃথিম্বীত।/তিনবার মাতৃতার রমিল নিশ্চিত।।/পৃথিম্বীত সুরাপান করে যে সকল।/গোরেতু উঠিতে তারা হইব পাগল।।/যে আনে যে বেঁচে যেবা পিয়ালা ফিরাএ।/সে সব পাগল হইব কিতাবেত কএ।।" আত্ম অহংকার বা বড়াই করা সম্পর্কে কোরান ও হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, তেমনি কবিও তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেছেন : ''এবাদত করি যেবা মনে গর্ব করে।/হেনমত ফল যেই গুণনাহি ধরে।।/গর্ব করএ যেবা সে কূপে রহব।/কিতাবেত বোলে স্বর্গ গন্ধনা পাইব।" স্বামী-স্ত্রী'র পরস্পর কর্তব্য বিষয়ে কোরান ও হাদিসে বহু আলোচনা রয়েছে, কবি সেসব আলোচনার অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন : ''সোয়ামি যদি ইঙ্গিত করএ নিজ নারী/ তুরিতে যাইব কাছে সব কাজে এড়ি।.../গৃহ হোন্তে নারী ভিন্ন স্থানে না যাইব।/যদি যায় ফিরিস্তান লায়ানত দিব।।"

সন্তানাদির শিক্ষার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য কবি শিক্ষার কর্তব্য বিষয়ে একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছেন। মজলিশের আদব-কায়দা বিষয়েও নানাদিক থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। সমাজের সভ্য মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করতে চাইলে মজলিশি রীতি-নীতি শিক্ষা করা অপরিহার্য। কবি বলেন মজলিশে গেলে চুপ করে থাকতে হবে, প্রয়োজন পড়লে কথা বলতে হবে। কবি ছিলেন শরিয়ত নিষ্ঠ মুসলমান। ফকিরি মত ও আচার বিধিকে তিনি বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য দ্বারা খণ্ডন করেছেন। সমাজে অনেকে যেমন দৈত্য ও ভূতপ্রেতের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস করতো তেমনি মৃত ফকির-দরবেশগণের মাজারে গিয়ে তাদের কাছে মনোবাসনা ব্যক্ত করতো।

যাতে তারা মধ্যস্থ হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে প্রার্থনাকারীর আবেদন মঞ্জুর করে দেন। কবির মতে এ সবই অসত্য ও ভ্রান্ত ধারণা। কবির মতামত শুধু যুক্তিনিষ্ঠ নয় শরিয়ত সম্মতও বটে। প্রচলিত ধারা অনুসারে পিরের কাছে বা মাজারে কিছু প্রার্থনা করলে ইমানদারের ইমান যে বজায় থাকে না এ কথা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে। শরিয়তের জ্ঞান বা কোরানের জ্ঞান না থাকার কারণেই যে মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয় সেকথা বুঝেই কবি জ্ঞান চর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪

সৈয়দ নুরুদ্দিন রচিত 'রাহাতুল কুলুব' কাব্যটি আসলে কোনো কাব্য গ্রন্থ নয়–শাস্ত্র কেতাবমাত্র। শাস্ত্র কেতাবের যথাযথ শৈল্পিক মূল্যায়ন করা যায় না। কেননা এই ধরণের গ্রন্থগুলো চরিত্র নির্ভর বা কাহিনি নির্ভর নয়। সাধারণত আমরা কোনো গ্রন্থের শৈল্পিক

মূল্যায়ন করি ভাবসৌন্দর্য ও রূপসৌন্দর্যের দিক থেকে—ভাবসৌন্দর্যের সাপেক্ষে গুরুত্ব পায় চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনি নির্মাণ, শিল্পীর জীবনদর্শন ও মনন ইত্যাদি। শাস্ত্র কেতাব হলেও কবি নিছক শাস্ত্রকথার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রাখেননি। কাব্যটির মধ্যে কোথাও কোথাও শিল্পসৌন্দর্যের উষ্ণ উত্তাপ অনুভূত হয়। উপমা ব্যবহারে কবির সহজাত দক্ষতা আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে : ''কেয়ামত ভয়ে অঙ্গ হইব জরজর।/অশত্থের পত্র যেন কম্পে থরথর।।/শাস্ত্র কথা না মানিলে হইবা বিকল/বাধি যেন উড়াইয়া লই যায় সকল।।" অলঙ্কার ব্যবহারের সাপেক্ষেও কবি কৃতিত্ব দাবি স্বীকার করতে পারেন। কাব্যে ব্যবহৃত অনুপ্রাস অলঙ্কার :'' চক্র মক্র বক্র তেজি এবাদক কর।/চক্র মক্র বক্র বাক্য না আনিবা মনে।/রঙ্গে ঢঙ্গে হুর সঙ্গে সুখে রইবা তুমি।" প্রবাদ প্রবচনের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার লক্ষ করা যায় স্থানে স্থানে : ''পাপ অঙ্গে না থাকিলে কি করিব কাজি/গন্দম রোপিলে কভু শালি ধন্য নয়।"

'রাহাতুল কুলুব' কাব্যটি উনিশ বাব বা পর্বে বিভক্ত। কবি প্রথম বাবে কেয়ামতের পূর্বাপর অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : ''শ্রমযুক্ত ঘর্ম জল জানু সম হইব।/কার কণ্ঠ বুক সম ঘর্মেত ডুবিব।।/কেয়ামত ভয়ে অঙ্গ হইব জরজর।/অশ্বত্থের পত্র যেন কম্পে থর থর।।" কাব্যের তৃতীয় বাবে বা পর্বে দোজখের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলা হয়েছে : ''দোজখ উপরে গিয়া করি বজ্রঘাত।/কালা বর্ণ সর্প সব বর্ষাইব তা।।" এই পর্বেই স্থান পেয়েছে রসুল কর্তৃক দোজোখের আজাব থেকে স্বীয় উম্মতদের উদ্ধার করার প্রচেষ্টা। কাব্যের এইপর্বে ছান্দিক স্পন্দনের মূর্চ্ছনা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে যায় না : ''পুনি পুনি রসুলে পুছিলা বারেবার।/কি রূপে দাহিব ভাই উম্মত আমার।'/এই মতে বহ দুঃখ দিব নিরঞ্জন।/কহিতে যে সব কথা বিদায় এমন।।/পুনি পুনি জিজ্ঞাসিব জিব্রাইল স্থান।/কিলাগিয়া আগমন কহমতিমান।।" প্রতিপন্ন হয়, শাস্ত্রকথামূলক রচনার সাধারণ প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে শিল্পের সৌন্দর্যলোকে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে কবি মনের সচেতন প্রয়াস।

প্রচলিত বাংলা ছন্দের মধ্যে পয়ার ছন্দকেই বেশি পছন্দ করেছেন কবি। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যেও রয়েছে এই একই প্রবণতা। পয়ার ছন্দকে গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় বেশ সহজে। তাই বোধহয় এই প্রয়াস। সে যাই হোক কবি নুরুদ্দিন যে তাঁর কাব্যে ছন্দের ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কাব্যের দু'এক জায়গায় ত্রিপদী ও লঘুত্রিপদী ছন্দও ব্যবহার করা হয়েছে : ''মিছাবাক্য কৈলে জীবন তেজিলে/নরকেত হইব স্থল/এথাজিনাকারি নরকেত পড়ি/গর্দভ হৈব সকল।" 'রাহাতুলকুলুব' কাব্যে কবি নুরুদ্দিন ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বা ভেদাভেদকে প্রশ্রয় না দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে। কবি মুসলিম ও কাব্যটি ইসলামি তত্ত্বমূলক। তা সত্ত্বেও আরবি-ফারসি শব্দের পাশাপাশি সংস্কৃত মূল শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে যথেষ্ট মাত্রায়। যেখানে আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার অনিবার্য ছিল সেসব ব্যতিরেকে অন্যত্র তৎসম বা তদ্ভব শব্দের প্রতি বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন কবি : ''সত্যি যদি এক নিরঞ্জন জানি থাকে, কালা বর্ণ সর্প সব বর্ষাইব তা।"

ইসলামি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিত, প্রবণতা ও সেই ধারায় কবি সৈয়দ নুরুদ্দিনের রাহাতুলকুলুব কাব্যটির নিবিড় পাঠ নিয়ে দেখা যাচ্ছে এখানে এমন কিছু বিষয় আছে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যত্র তার প্রায় দেখা মেলে না। একজন মানুষের আদর্শ কী হবে, সামাজিক-রীতি-নীতি, সভা বা মজলিসের নীতি কেমন হওয়া উচিৎ, পিতা-মাতার প্রতি কেমন আচরণ করা উচিৎ অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মানুষ কীভাবে তার সামাজিক জীবনকে যাপন করবে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে এখানে, যা অন্যত্র অতি দুর্লভ। কৃত্তিবাসী রামায়ণেই বিষয়টির যা একটু প্রতিবিম্বন আছে। ইসলামি সাহিত্য সেদিক থেকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারায় স্বতন্ত্র ও নিজস্বতায় ভাস্বর এক অধ্যায়। এখন প্রশ্ন, ইসলামি সাহিত্যের এই ধারায় রাহাতুল কুলুব কাব্যটির অবস্থান ঠিক কোথায়? ইসলামি সাহিত্য শাখার অপরাপর রচনার সঙ্গে রাহাতুল কুলুব কাব্যের তুলনামূলক পাঠ নিয়ে আমরা দেখেছি কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন এ ক্ষেত্রে সহযোগিদের তুলনায় বেশ একটু এগিয়ে রয়েছেন। অন্যরা ইসলামি ধর্মাদর্শের এক একটি দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিষয়ের সামগ্রিক উপস্থাপনায় অনেকেরই যথেষ্ট অনীহাবোধ বা দক্ষতার অভাব রয়েছে। সৈয়দ নুরুদ্দিন ও তাঁর রাহাতুল কুলুব কাব্যটি সেদিক থেকে মোটের উপর ব্যতিক্রম। সামগ্রিকতা কাব্যটির শ্রেষ্ঠত্বের দিক।

গ্রন্থঋণ

আকর গ্রন্থ

১। সৈয়দ নুরুদ্দিন জীবন ও গ্রন্থাবলী—খন্দকার মুজাম্মিল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

সহায়ক গ্রন্থ

১। ইসলামি বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
২। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান— দীনেশচন্দ্র সেন, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, দে'জ, কলকাতা
৪। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা—মনসুরউদ্দীন, রতন পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬৫
৫। বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ চরিত—মুহম্মদ মজীরুদ্দিন মিঞা, রাজশাহী, ১৯৮৩
৬। বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত—মুহম্মদ মজীরুদ্দিন মিঞা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
৭। মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থ ভূমিকা (১-২)—আহমদ শরীফ, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭
৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম কবি—আজহার ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২
৯। মুসলিম বাংলা সাহিত্য—এনামুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
১০। মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য—আনিসুজ্জামান, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৯
১১। মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক—গোলাম সাকলায়েন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৭